*Pratidhwani the Echo*
*A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science*
***ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)***
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
*Volume-IX, Issue-II, January 2021, Page No.26-31*
*Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India*
*Website: http://www.thecho.in*

# আসামের চিংফৌ জনগোষ্ঠী ও তাদের সমাজব্যবস্থা

**ড. নীতিশ দাস**
*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মার্ঘেরিটা মহাবিদ্যালয়, মার্ঘেরিটা*

***Abstract***

*The Singpho are an ethnic group who are ancient tribe of Mongoliod races. They largely inhabit in the Kachin Hills in the northern Myanmar's Kachin state and neighbouring Yunnan Province of China and North Eastern India's Arunachal Pradesh and Assam. The Singpho society is not as complex as of other tribal societies. They believe in Buddhism and they sacrifice buffaloes and other animals. They believe in grace. They are exogamous and have cross-cousin marriage. They have several class and are governed by chiefs.*

***Keyword : Ethnic Group, Mongolid Races, Singpho Society, Buddhism, Several Class***

**ভূমিকা:** উত্তরপূর্ব ভারত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মিলন ভূমি। এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতির সমাগম ঘটেছে। বিশেষকরে আসামে বিভিন্ন সময়ে চিংফৌ, মিচিং, সোনোবাল, কছারী, দেউরী, চাহ জনগোষ্ঠী, কার্বি, ডিমাছা, বড়ো, মরান, মটক, টাইফাকে, হাজং, টাই খামিয়ং, মান টাইভাষী, মিকির, মিজো, লালুং, টাংছা, মিচমি প্রভৃতি জনগোষ্ঠী এসে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করে অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যের ধারণাকে সুদৃঢ় করে। আসামে বসবাস করা প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম হল চিংফৌ সমাজের লোকেরা। আসাম এবং অরুণাচল প্রদেশে বসবাস করা চিংফৌরা ভাষিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে মূলত তিব্বত বর্মী। চিংফৌ জনগোষ্ঠীর ইতিহাস এবং তাদের জীবনধারা, খাদ্যাভাস, নৃত্য-গীত, উৎসব-পার্বণ ইত্যাদির বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ আছে।

চিংফৌ শব্দের বাংলা অর্থ হল মানুষ। বৃহত্তর মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত চিংফৌরা পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। চিংফৌদের আদি বাসস্থান ও তাদের ইতিহাস নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা যায়। ঐতিহাসিক নিদর্শন মতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ থেকে ৭০০ সনের মধ্যে চিংফৌরা মঙ্গোলীয়া থেকে তিব্বতে আসে এবং সেখান থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১০০ বছর আগে তারা ভারতে পদার্পণ করে। উত্তরপূর্ব ভারতের বিশেষ করে আসাম ও অরুণাচল প্রদেশে তারা বসতি স্থাপন করে। তিব্বতের 'মজইচিংরা বুম' নামের মালভূমিতে থাকার সময় থেকে চিংফৌদের ইতিহাসের সূত্রপাত হয়েছে বলে তারা বিশ্বাস করে। চিংফৌরা উত্তরপূর্ব ভারত ছাড়াও মায়ানমার, চীনের য়ুনান অঞ্চল, থাইল্যান্ড প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে নিজের অস্তিত্বকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে।

চিংফৌ জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রধানত পাঁচটি ভাগ আছে, যেমন-মিরিপ (Marip), লুঃথ (Lahtaw), লাফাই (Lahpai), ইনখুম (N Hkum) এবং মরান (Maran) । অঞ্চল ভেদে তাদের নামকরণ ভিন্ন। আসামের মধ্যে তারা চিংফৌ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত অন্যথায় মায়ানমারে তাদের পরিচয় কাচিন নামে। আবার একই জনগোষ্ঠীর লোকেদের চীনের মধ্যে জিংফৌ নামে জানা যায়। জনসংখ্যার দিক থেকে ভারতের তুলনায় চীন বা মায়ানমারের চিংফৌদের সংখ্যা অনেক বেশি। কোন কোন স্থানে তারা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত সংরক্ষণ বা সুযোগের অভাবে উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিশেষ করে আসামের চিংফৌদের অস্তিত্ব বিপন্ন। যদিও তারা প্রধানত পৃথিবীর তিনটি দেশে বসতি স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে তথাপি তাদের ভাষা সংস্কৃতির মধ্যে ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। চিংফৌরা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়লেও বা প্রবজিত হলেও চীন, মায়ানমার ও ভারতবর্ষকে নিজের মূলভূমি হিসেবে বিশ্বাস করে। আহোম রাজা গৌরীনাথ সিংহের

রাজত্বকালের সময়ে চিংফৌরা আসামে প্রবেশ করে বলে ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায়। উজান আসামের বিশেষ করে পাটকাই অঞ্চলে চিংফৌরা বসতি স্থাপন করে। চিংফৌরা কখন ভারতে পদার্পন করে তা নিয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। আবার অনেকের মতে চিংফৌরা দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতে আসে। ঐতিহাসিক দলিল মতে জানা যায় চিংফৌদের সঙ্গে আরও কিছু জনগোষ্ঠী তিব্বত থেকে ভারতে আসে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-গারো, কছারী, কুকি, নাগা, মিচমি, আবর প্রভৃতি। উত্তরপূর্ব ভারতে বসতি স্থাপন করার পর থেকে চিংফৌদের সঙ্গে অন্যান্য কিছু স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। সে সময়ে টাই জনগোষ্ঠীর আগ্রাসনের ফলে অনেক চিংফৌ সম্প্রদায়ের লোকেরা এই অঞ্চল থেকে বিতাড়িত হয়। অন্যদিকে মৌংগ টাই রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর চিংফৌরা আবার নিজের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। যদিও বিভিন্ন সময়ে বিরোধী শক্তির আক্রমণের ফলে চিংফৌরা ছত্রভঙ্গ হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শেষপর্যন্ত নিজের কৃষ্টি, সভ্যতা, স্বকীয়তাকে অক্ষত রাখতে সক্ষম হয়। বর্তমানে আসামের পূর্বপ্রান্তের মার্ঘেরিটা অঞ্চলের নামফাই, জাগুন, মানজেপথার গাঁও, কথাঃ গাঁও, নিংগাম, মারাংকং, টাংচা গাঁও, হাচাক, কুমচাই, পাচুন, বিছাগাঁও, শিবসাগর এবং অরুণাচল প্রদেশের কিছু অঞ্চলে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে ইতিহাসের পাতায় নজির রেখে যায়।

**চিংফৌ রাজ্যঃ** আসামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি জনগোষ্ঠীর বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির পরিচয় তুলে ধরার প্রয়াস করেছেন অনেকেই। কিন্তু তা যে খুব পর্যাপ্ত তাও নয়। যদিও কিছু কিছু আগ্রহী গবেষক চিংফৌ, টাংছা, টাইফাকে, টাই খামিয়ং প্রভৃতি জনগোষ্ঠী সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের গবেষণা শুরু করেছেন। চিংফৌরা অতি শক্তিশালী ও পরাক্রমী জাতি হিসেবে জানা যায়। উজান আসামের লিডু থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে টিরাপ নদীর তীরে অবস্থিত বিছা গাঁওর ইতিহাস অতি প্রাচীন। চিংফৌ সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় দুশো বছর পূর্ব থেকে বিছা গ্রামে বসবাস শুরু করে। এই জনগোষ্ঠীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে অনেক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। কর্ণেল এস এফ হেনরীর মতে আহোম রাজা গৌরীনাথ সিংহের রাজত্বকালে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চিংফৌরা আসামে প্রবেশ করে। আবার অনেকের মতে আহোমরা আসামে প্রবজন করার আগেই চিংফৌরা আসামে পদার্পণ করে। আসামের বিছাগাঁও-এ চিংফৌরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। বিখ্যাত ইতিহাসবিদ সুরেন্দ্রনাথ বরুয়ার মতে, *"Bisa was the Paramount Chieftain over a number of dozen clans, Bisa had long ago exercised the same power in Hukang Valley before leaving the area."* চিংফৌরা প্রধানত নদীতীরে এবং জঙ্গলে বসবাস করতে পছন্দ করে। যুদ্ধবিগ্রহে পারদর্শী চিংফৌ জনগোষ্ঠীর লোকেরা এক সময় ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। উল্লেখ্য যে উজান আসামে ইংরেজ আসার সময়ে চিংফৌদের আধিপত্য আসামের বিস্তৃত অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আসামের প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'অরুণোদয়'-এর মধ্যে তার যথেষ্ট প্রমান পাওয়া যায়। আলোচ্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'চিংফৌ বিবরণ'-এ বর্ণিত আছে চিংফৌ রাজ্যের চার সীমা উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, পূর্বে মিচিমি পর্বত, দক্ষিণে পাটকাই পর্বত এবং পশ্চিমে নদীহিংমুখর থেকে সোজাসুজি বুঢ়ীদিহিং নদীর দক্ষিণ পর্যন্ত। চিংফৌদের শাসন ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে বিভক্ত ছিল।

**চিংফৌদের ধর্মবিশ্বাস:** আসাম বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মিলন ভূমি। প্রায় প্রতিটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি আছে। প্রত্যেক জনগোষ্ঠীই পুরুষানুক্রমে কিছু কিছু রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, ধর্ম-বিশ্বাস পালন করে আসছে। প্রাচীনকালে চিংফৌরা প্রধানত প্রকৃতির উপাসক ছিল। তারপর ধীরে ধীরে তাদের সমাজে ছড়িয়ে পরে বিভিন্ন ধরণের 'নাট' (দেবতা)-এর আরাধনার প্রভাব। দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক সময় বলি, মদ-পানীয় ইত্যাদির দ্বারা পূজা অর্চনা করতেন। পূজা অর্চনা করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল 'দুমছা' নামের এক শ্রেণির পুরোহিতের উপর। সে সময়ে হিন্দু ধর্মের বিশেষ প্রভাব যে তাদের উপর পড়েছিল সে কথা বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে ১৫০ বছর পূর্বে 'নাট' বা দেবতা পূজা অর্চনা পরিহার করে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধ ধর্মকেই গ্রহণ করে। উজান আসামের চিংফৌদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারে অলৌকিক গুণসম্পন্ন ব্রহ্মদেশিয় বৌদ্ধ সন্ন্যাসী 'পিয়েনডুবেন চিরাদ'-এর ভুমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ব্রহ্মদেশ থেকে পাটকাই অতিক্রম করে এসে উজান আসামে বসবাস করা চিংফৌদের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। সে সময়ে চিংফৌদের সঙ্গে বসবাস করা অন্যান্য কিছু জনগোষ্ঠী বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধ ধর্মকেই গ্রহণ করে। পূর্বে 'নাট' পূজা অর্চনা করা চিংফৌরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমাজব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। বিশেষ করে প্রাণী হত্যা, মদ-পানীয় ইত্যাদির ব্যবহার তাদের সমাজে ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। যুদ্ধ বিগ্রহে পারদর্শী চিংফৌ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পঞ্চশীলের নীতি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী চিংফৌরা

উপাসনা করার জন্য গ্রামে গ্রামে বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করে তাদের ধর্মচর্চা অব্যাহত রাখেন। ধীরে ধীরে বৌদ্ধবিহারই তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মূল কেন্দ্রস্থল হয়ে পড়ে। কিন্তু যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করা চিংফৌ যোদ্ধাদের বলিবিধানের মাধ্যমে দেবতার মতো পূজো করা হয়। তাদের মধ্যে আরাধ্য কয়েকজন নাট হল-মুঃনাট (ইন্দ্রদেবতা), চ্ছুথুং (বনদেবতা), বুমনাট (পাহাড় দেবতা), চুঃনাট (অপমৃত্যুর দেবতা), চিলান নাট (রোগের দেবতা)। চিংফৌ সমাজের মধ্যে নাট বা দেবতার পাশাপাশি বিভিন্ন অপদেবতার অস্তিত্বকে স্বীকার করে। অপদেবতার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখিত -কানাট (অপদেবতা), বাখাপ নাট (গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত করে), চিংগাম নাট (পেটের অসুখে ভোগায়), নিংশুম নাট (গৃহপালিত জীবজন্তুকে আক্রমণ করে)। পূর্বে তারা নাট বা দেবতা পূজায় বিশেষভাবে আগ্রহী ছিল কিন্তু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পূজা অর্চনায় অনীহা পরিলক্ষিত হয়। আসামের চিংফৌদের মতো অরুণাচলের চিংফৌরাও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রহ্মদেশীয় ধর্মগুরুদের তত্ত্বাবধানে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে। ফলস্বরূপ তারা বৌদ্ধধর্মীয় রীতি-নীতি এবং উৎসব অনুষ্ঠান যথা সম্ভব পালন করে চলে। প্রত্যেক চিংফৌ জনগোষ্ঠীর লোকেরা গৃহনির্মাণ করার সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার পূর্বদিকে বৌদ্ধমূর্তি বা প্রার্থনা গৃহ নির্মাণ করে।

**চিংফৌ জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা:** চিংফৌরা প্রধানত কৃষিজীবী। কৃষি জমিতে তারা ধান, সরিষা, আলু, শাক ও কচু প্রভৃতি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। বীজ বপনের পূর্বে কৃষি জমিকে ভালো করে উর্বরা করে নেয়। গরু বা মহিষের দ্বারা হাল চাষ করে পরম্পরাগত পদ্ধতির দ্বারা। এসব কাজে পুরুষের সঙ্গে নারীরাও সহযোগ করে। তাছাড়া হাঁস, মুরগী, শুকর, গরু, ছাগল ও মহিষ পালন করে পারিবারিক চাহিদা পূরণ করে। শুকরের মাংসের চাহিদা তাদের সমাজে খুব বেশি। অনেকে আবার বর্তমান সময়ে সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে শুকর ও মুরগীর ফার্ম খুলে প্রচুর টাকা রোজগার করে।

উত্তরপূর্ব ভারতে বিশেষ করে আসামের জলবায়ু চা চাষের উপযুক্ত স্থান। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশে চা রপ্তানি করে দেশের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করে। আসামের অর্থনীতিতে চা শিল্পের বিশেষ ভুমিকা আছে। আসামের চা চাষের ইতিহাসের সঙ্গে চিংফৌদের অবদান উল্লেখনীয়। উজান আসামের পাটকাই পাহাড়ের মধ্যে বসবাস করা চিংফৌরা অতি প্রাচীন কাল থেকে চায়ের ব্যবহার আরম্ভ করে। তারা চা-কে 'ফালাপ' বলে। চা গাছের কচি পাতা ও কুড়িকে সংগ্রহ করে এক বিশেষ পদ্ধতির মাধ্যমে শোধন করে তাকে চা হিসেবে ব্যবহার করে। সে পাতা জলে গরম করে পানীয় হিসেবে ব্যবহার করে। চিংফৌরা প্রধানত আহার গ্রহণ করার পর চা বা 'ফালাপ' পান করে। প্রাচীন কালে তারা প্রণালীবদ্ধভাবে চা চাষের সূত্রপাত করেনি। ঘরের আশেপাশের জঙ্গল কেটে চা চাষ আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে তা এক বৃহৎ শিল্পে রূপান্তরিত হয়। যদিও চীন দেশে প্রথম চায়ের আবিষ্কার হয় কিন্তু আসামে চায়ের উৎপাদন অনেক বেশি। ১৮২৬ সনের ২৪ ফেব্রুয়ারি ইয়াণ্ডাবুর সন্ধির পর আসামের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে ইংরেজরা। ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আসামের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক দিক থেকে অনেক পরিবর্তন দেখা যায়। জেনকিনস এবং এনড্রু চার্লটন প্রভৃতি ইংরেজ শাসকের নেতৃত্বে আসামের চা চাষের সম্ভবনা সম্পর্কে এক ব্যাপক অনুসন্ধান শুরু হয়। ইয়াণ্ডাবুর সন্ধির পূর্বে রবার্ট ব্রুস যখন আসামে আসেন তখন চিংফৌরা প্রথম তাকে চায়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা আসামে পরিকল্পিতভাবে চা চাষ আরম্ভ করে। ফলস্বরূপ আসামের বিভিন্ন প্রান্তে চা বাগান খোলার এক প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে আসামের কৃষকরাও চা শিল্পে লিপ্ত হয়। সে সময়ে আসামের চা কলকাতা হয়ে আন্তর্জাতিক বাজারে চালান দেওয়া হত। চা শিল্পের লাভজনক ব্যবসার সঙ্গে চিংফৌরা অতপ্রতভাবে জড়িয়ে পড়ে।

বয়ন শিল্পে আসামের এক গৌরবময় ঐতিহ্য আছে। আহোম রাজত্বকালে এই শিল্পের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রাচীন কাল থেকে আসামের অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মতো চিংফৌরা নিজের প্রয়োজনীয় পোশাক পরিচ্ছদ নিজেরাই তৈরি করে। সে ক্ষেত্রে নারীদের বিশেষ ভূমিকা আছে। প্রায় প্রত্যেক চিংফৌ নারী কমবেশি পরিমাণে বয়ন শিল্পের সঙ্গে জড়িত। মহিলারা নিজে সূতা কেটে কাপড় তৈরি করে। কাপড় তৈরি করতে তারা প্রধানত প্রাকৃতিক ভাবে উপলব্ধ রং ব্যবহার করে। চিংফৌ সমাজে মেয়ের যৌতুক রূপে তাতশাল দেওয়া হয়। তাদের জাতীয় পোশাক পরিচ্ছদ অন্যদের থেকে পৃথক। পুরুষেরা পরিধান করে পরম্পরাগত লুঙ্গি ও পাগড়ি এবং নারীরা পরিধান করে মেখেলা ও রিহা প্রভৃতি। উল্লেখ্য যে চিংফৌ বিধবা মহিলাদের পোশাকপরিচ্ছদে কোন বাধ্যবাধকতা নেই। অন্যান্য চিংফৌ সধবা নারীর মতো বিধবা নারীরা নানা রঙের পরম্পরাগত পোশাক পরিধান করে। এ ধরণের পরম্পরাগত চিংফৌ পোশাক পরিচ্ছদের চাহিদা বাজারে যথেষ্ট পরিমাণে আছে। বয়ন শিল্পের মাধ্যমে চিংফৌরা অনেক স্বাবলম্বী জীবন যাপন করে।

**চিংফৌ সমাজে প্রচলিত লোকবিশ্বাস:** মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত চিংফৌ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের লোকবিশ্বাস অতি প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে। সংস্কৃতি একটা জাতির জাতীয় জীবন ধারা। আর লোকসংস্কৃতি লোকজীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট। অনেক সময় মানুষ নিজের অদৃষ্টকে জানার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে। অদৃষ্টকে জানার ব্যাকুলতার মাধ্যমে জন্ম নেয় বিভিন্ন ধরণের লোকবিশ্বাসের। লোকবিশ্বাস লোকসংস্কৃতিরই উপাদান। কিছু কিছু প্রাকৃতিক ঘটনা বা সচরাচর ঘটা নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা দিলে মানুষ তাকে অদৃষ্টের পূর্বাভাস বা অমঙ্গল বলে ধরে নেয়। মৃত্যু জীবনের চরমতম সত্য। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহকে কেন্দ্র করে চিংফৌ সমাজে নানা ধরণের লোকবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের সমাজে প্রচলিত কিছু কিছু লোকবিশ্বাসের মধ্যে - যাত্রাকালে বিড়াল বা সজারু দেখে যাত্রা করলে অমঙ্গল হয় বলে তাদের ধারণা। যাত্রাকালে হলৌ বানর দেখলেও অশুভ বলে বিবেচনা করে। আমাদের সমাজে যেমন এক শালিক বা চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়ে যদি বিড়াল অতিক্রম করে তাহলে অশুভ হবে বলে আমাদের মনে ভয় জাগে। চিংফৌদের ধারণা কেউ যদি স্বপ্নে হাসি অথবা নৃত্য করা দেখে তাহলে তাদের অমঙ্গল হয়। তারা বিশ্বাস করে ঝড়ে ভেঙ্গে যাওয়া গাছের বীজ যদি কেউ খায় তাহলে সেই যুবক যুবতীর মৃত্যু হয়। আবার অন্যদিকে চিংফৌ নারীর বিয়ের সময় যদি তার সঙ্গে শস্য দেওয়া হয় তাহলে সেই নারী মাতৃত্বের অধিকারিণী হয় বলে চিংফৌরা বিশ্বাস করে। যদি কোনো গাছে বজ্রপাত হয় তাহলে সেই গাছের কাঠ ব্যবহার করে না, এমনকি সে গাছের আশেপাশে গেলে তাদের কুষ্ঠরোগ হয় বলে তাদের ধারণা। সাপ বা কাক রাস্তায় পড়ে থাকলে অশুভ হয় বলে তারা ধরে নেয়। গৃহপালিত কুকুর বা বিড়াল যদি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় তাহলে অমঙ্গল অনিবার্য। বিপরীত দিকে যদি অন্যের ঘর থেকে কুকুর, বিড়াল বা মৌমাছি এসে নিজের ঘরে আশ্রয় নেয় তাহলে গৃহস্বামীর মঙ্গল হয়। বাঙালি সমাজে যেমন এক ধরণের লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে যে লক্ষ্মীপেঁচা যদি ঘরে প্রবেশ করে তাহলে সেই ঘর ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়। চিংফৌ সমাজেও এভাবে যদি কোনো লক্ষ্মীপেঁচা ঘরের পাশে ডাকে তাহলে ঘরের বা গ্রামের অমঙ্গল হয় বলে তাদের বিশ্বাস। বিভিন্ন ধরণের খাদ্যসামগ্রী নিয়েও তাদের সমাজে নানা ধরণের লোকবিশ্বাস চলে আসছে। মুরগীর ঠ্যাং ছেলেদের খেতে দেওয়া হয়, কিন্তু মেয়েদের খেতে নিষেধ আছে। তেমনি মাতা-পিতাকে কোনো জীবজন্তুর মাথা খেতে দিলে তাদের আয়ু কমে বলে চিংফৌ সমাজে একধরণের ধারণা প্রচলিত আছে। গর্ভবতী মহিলারা সজারুর মাংস ভক্ষণ থেকে বিরত থাকে। তেমনি ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া গাছের ফলমূল ভক্ষণ করলে অপমৃত্যু হয় বলে এক ধরণের বিশ্বাস চিংফৌ সমাজে প্রচলিত। সন্তান প্রসবের পূর্বে যদি ভূমিকম্প হয়, উল্কাপাত দেখা যায়, চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটলে ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী মন্দির অথবা ঘরে প্রতিবিধান করার ব্যবস্থা আছে। প্রতিকার না করে যদি সন্তান প্রসব হয় তাহলে সন্তানের ভবিষ্যৎ অশুভ হয় বলে চিংফৌরা বিশ্বাস করে। গর্ভবতী নারীরা অমাবস্যার সময় খুব সাবধানে চলে, সে সময় তারা কোনো প্রতিবেশির ঘরে যাওয়া আসা করে না। কোনো দুঃসংবাদ বা মৃত্যুর সংবাদ যদি গর্ভবতী নারীরা শুনতে পায় তাহলে তাদের সম্ভাব্য সন্তানের জন্মের সময় বিভিন্ন জটিলতা আসার সম্ভাবনা থাকে। গর্ভস্থ সন্তানের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে সন্তান সম্ভবা মহিলারা কোনো ধরণের জীবহত্যা করে না। বিশেষ করে কোনো ধরণের সাপ জাতীয় প্রাণী হত্যা করে না। শুধু গর্ভবতী নারীরাই নয় সম্ভাব্য সন্তানের পিতাও সে সময় নানা ধরণের সামাজিক রীতি-নীতি মেনে চলে। সম্ভাব্য সন্তানের পিতা এমতাবস্থায় মৃতদেহের পাশে যায় না। টানা দিয়ে কোনো রশি বাঁধে না। সন্তান প্রসব হলে পাড়া-প্রতিবেশিরা একত্রিত হয়ে ঘরে তৈরি এক ধরণের মাদক দ্রব্য (লাওপানী) গ্রহণ করে আনন্দ প্রকাশ করে। সন্তান জন্মের পর ধাত্রীই প্রথম সন্তানের নামকরণ করে। তা নাহলে অপদেবতা সন্তানের নামকরণের সুবিধা গ্রহণ করে। তিনদিন পর্যন্ত সন্তানকে আঁতুড়ঘরেই রাখা হয়। চতুর্থ দিন নবজাতককে বাইরে বের করে কিছু সামাজিক নিয়মনীতি মেনে পরিবেশের সাথে পরিচয় করানো হয়। চিংফৌ সমাজে নানা ধরণের লোকবিশ্বাস আছে, কিছু কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক আর কিছু কিছু সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বিশ্বায়নের যুগে অনেক গবেষণানুসন্ধানী লেখক চিংফৌ সমাজের এই সমস্ত লোকবিশ্বাস সমূহ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণ করে তাদের উপযোগিতা সম্পর্কে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

**চিংফৌ সমাজে মৃত্যু নিয়ে কিছু ধারণা:** বৌদ্ধ ধর্মীয় চিংফৌদের মধ্যে নানা ধরণের নিয়ম নীতি প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। তাদের সমাজে মৃতদেহ সমাধি করা অথবা দাহ করা- এই দুই পদ্ধতিতেই সৎকার করা হয়। যদি কোনো বয়স্ক চিংফৌ লোকের মৃত্যু হয় তাহলে মৃতদেহকে শুদ্ধ কাপড় দিয়ে ঢেকে কফিনের মধ্যে রেখে সসম্মানে কিছু সময় ঘরের ভিতর রাখা হয়। আবার ঘরের বাইরে যদি কোনো লোকের মৃত্যু হয় তাহলে তাকে চিংফৌ নিয়ম অনুসারে ঘরের বাইরেই রাখা হয়। চিংফৌ সমাজের রীতি অনুযায়ী কোনো লোকের যদি কঠিন রোগে মৃত্যু হয় তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মৃতদেহের দাহ বা সমাধির ব্যবস্থা করা হয়। অবিবাহিত লোকের মৃত্যু হলে বাঁশের উপর শবদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়ার রীতি চিংফৌ

সমাজে বর্তমান। নিঃসন্তান অবস্থায় কোনো মহিলার মৃত্যু হলে চিংফৌ লোকেরা মৃতদেহের দুই পায়ে বাঁশের বা লোহার পেরেক মেরে শ্মশানে নিয়ে যায়।

চিংফৌ সমাজ আত্মাকে বিশ্বাস করে চলে। তাদের ধারণা মৃতকের আত্মা তিন চারদিন পর্যন্ত ঘরের আশেপাশে ঘুরতে থাকে। কফিন বানানোর জন্য এক বিশেষ ধরণের গাছের প্রয়োজন হয়। গাছকে কাটার আগে তাকে ভালোভাবে পূজো করা হয়। মৃতদেহ কফিনের মধ্যে রাখার আগে কফিনকে পরিষ্কার করতে হয়, কারণ তাদের মনে সন্দেহ থাকে যে সেই কফিনের মধ্যে অন্য কারো আত্মা প্রবেশ করতে পারে। মৃত্যুর পর চতুর্থ দিন কফিনকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়ার আগে ঘরের নারীরা পাখা দিয়ে বাতাস করে আত্মার চিরশান্তি কামনা করে। চিংফৌ সমাজে মৃত্যুর সপ্তম দিন আদ্যশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে, সেখানে মহিষ, শুকর বা মুরগী বলি দিয়ে পাড়া প্রতিবেশি, আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ খাওয়ায়।

**চিংফৌদের পরম্পরাগত খাদ্য:** আসামের চিংফৌরা মূলতঃ কৃষিজীবী এবং ধানই তাদের প্রধান শস্য। ধানের চাষ ছাড়াও তারা কমলা, সরিষা, মাষকালাই প্রভৃতি চাষ করে। সম্প্রতি এই অঞ্চলের কিছু কিছু যুবক মিলে জৈবিক পদ্ধতিতে চাপাতা চাষের প্রতি মনযোগ দিয়েছে। চিংফৌ সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত খাদ্যের মধ্যে অন্যতম হল 'টোপোলা ভাত' বা 'চাট-মাকাই'। এই টোপোলা ভাত তৈরির জন্য এক বিশেষ ধরণের চাল ব্যবহার করে তারা। 'মিয়াটং' এবং 'খলু' জাতীয় চাল প্রথমে তারা পাঁচ ছয় ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখে। তারপর বিশেষ পদ্ধতিতে রান্না করে এক ধরণের পাতা দিয়ে মোড়কে রাখে। চিংফৌরা কোনো কোনো সময় মাছ-মাংস, শাক-সব্জি প্রভৃতি আগুনে পুড়ে বা ভাপে সিদ্ধ করে খায়। অসমীয়া সমাজের পরম্পরাগত খাদ্য খরিচা (কচি বাঁশ দিয়ে তৈরি এক ধরণের আচারের মত দ্রব্য) অনেক ক্ষেত্রে চিংফৌরাও ব্যবহার করে থাকে। মাছ পুড়ে খরিচার সঙ্গে মিশিয়ে এক ধরণের চাটনি প্রস্তুত করে টোপোলা ভাতের সঙ্গে খায়। অনেকে কচুর সঙ্গে টকৌ গাছের কচি পাতা সিদ্ধ করে এক বিশেষ পরম্পরাগত খাদ্য প্রস্তুত করে।

চিংফৌরা বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদ সোপ প্রস্তুত করে। তার মধ্যে অন্যতম হল কলার মোচার সোপ। সোপ তৈরি করার সময়ে প্রথমে তারা ছোট ছোট মাছ রৌদ্রে শুকিয়ে নেয়। তারপর আদা, রসুন ও একধরণের বীজ পাটাতে বেটে নেয়। শুকনো মাছ, কাচালঙ্কা প্রভৃতি কুচি কুচি করে কুটে নিয়ে তার সঙ্গে আলু বা কচু প্রভৃতি দিয়ে ভালো করে মিশ্রণ প্রস্তুত করে গরম জলে পরিমাণ মতো নুন দিয়ে পরম্পরাগত সোপ প্রস্তুত করে। তাছাড়া টমেটো, তিতা করলা, আলু প্রভৃতি পুড়ে পিয়াজ, লঙ্কা এবং বিভিন্ন স্থানীয় মশলার পাতা ব্যবহার করে এক ধরণের মিশ্রণ তৈরি করে খায় চিংফৌরা। চাউল দিয়ে তৈরি এক ধরণের মাদকদ্রব্য চিংফৌসমাজে বহুল প্রচলিত। তাছাড়া চিংফৌরা বিভিন্ন ধরণের পিঠা পুলি তৈরি করে। তাদের পরম্পরাগত খাদ্যসম্ভারের খাদ্যগুণ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। তারা বিভিন্ন ধরণের সিদ্ধ খাবারই বেশি পছন্দ করে। আর তেল বা গুঁড়ো মশলার ব্যবহার খুব কম করে। বর্তমান সময়ে আসামের বিভিন্ন স্থানে চিংফৌদের পরম্পরাগত খাদ্যের চাহিদার জন্য বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

**চিংফৌদের জাতীয় উৎসব (স্বপংয়'ঙ মানাও পয়):** উত্তরপূর্বাঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় সব জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের আচার অনুষ্ঠান, উৎসব, ধর্মীয় রীতি-নীতি প্রভৃতি সাগ্রহে পালন করে। গীত-নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হওয়া চিংফৌদের জাতীয় উৎসব 'স্বপংয়'ঙ মানাও পয়' তাদের বর্ণাঢ্য সংস্কৃতির অন্যতম নিদর্শন। প্রতি বৎসর ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটিতে হাজার হাজার চিংফৌরা একত্রিত হয়ে জাতীয় উৎসব পালন করে। চিংফৌদের মতে টিংলিয়ঙে নিজের পিতা স্বপংয়ং এবং বিশ্বসৃষ্টিকর্তা (মাঠুম মাঠা)-র কাছে আশীর্বাদ লাভের জন্য তাদের গুণানুকীর্তন উৎসব পালন করেছিল। কিন্তু কালক্রমে এই উৎসব চিংফৌ পূর্বপুরুষ স্বপংয়ঙর স্মৃতির উদ্দেশ্যে পালন করা উৎসব রূপে পরিণত হয়। চিংফৌ ভাষায় 'মানাও' শব্দের অর্থ হল নৃত্য এবং 'পয়' শব্দের অর্থ হল উৎসব। সুতরাং জাতীয় উৎসবের নামের মধ্যেই বোঝা যায় এই অনুষ্ঠানে নৃত্যের বিশেষ ভূমিকা আছে। লোকবিশ্বাস অনুসারে চন্দ্র-সূর্য সৃষ্টির পর সৃষ্টিকর্তা জীব-জন্তু, পশু-পাখি, গাছ-ফুল-ফল প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন ফুল ফলের স্বাদ গ্রহণ করে পক্ষীকুল আনন্দে আত্মহারা হয়ে পক্ষীরাজ ধনেশের নেতৃত্বে সৃষ্টিকর্তার গুণকীর্তন করে এক নৃত্য উৎসবের আয়োজন করেছিল। পক্ষীকুলে আয়োজন করা এই আনন্দ উৎসবে 'মাংদিংয়াউ' নামের এক লোক তাতে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। সেই আনন্দ উৎসবে পক্ষীকুলের প্রদর্শিত নৃত্য মাংদিংয়াউ-এর মাধ্যমে চিংফৌ সমাজে ছড়িয়ে পড়ে। চিংফৌদের জাতীয় অনুষ্ঠান দেখার জন্য দূর দূর থেকে মানুষের সমাগম হয়। সবাই মিলে নৃত্য গীতের মাধ্যমে পরমপিতা সৃষ্টিকর্তার আরাধনা করে। উৎসবের মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য বলি বিধানেরও ব্যবস্থা আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পর থেকে আসাম ও অরুণাচল প্রদেশের চিংফৌরা ধীরে ধীরে বলি বিধানকে সম্পূর্ণরূপে

ত্যাগ করে। বর্তমানে বিভিন্ন সংঘটনের তৎপরতায় এবং আসাম সরকারের উদ্যোগে চিংফৌদের জাতীয় উৎসবকে এক পর্যটন শিল্পে রূপায়নের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

**উপসংহার:** চিংফৌরা উত্তরপূর্ব ভারতের এক অন্যতম বর্ণাঢ্য জনগোষ্ঠী। আসামে বসবাস করা চিংফৌরা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে এলেও নিজের স্বকীয়তাকে বিসর্জন দেয়নি। তাদের সমাজ সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকে পরিবর্তন সাধিত হলেও মূলত সংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান - বাসস্থান, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাস, রীতিনীতি, লোকবিশ্বাস, লোকউৎসব প্রভৃতির বিভিন্ন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সমূহ এখনও নিঃশেষ হয়ে যায়নি। একদিকে চিংফৌ ভাষার সংকট, অন্যদিকে নিজের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম এবং রাজনৈতিকভাবে বঞ্চনার শিকার আসামের অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মতো চিংফৌদের মধ্যেও শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় অসন্তোষ প্রদর্শিত হয়। আবার একই সময়ে উচ্চশিক্ষিত চিংফৌরা উন্নয়নের মূখ্য ধারার সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে রাখে। চিংফৌ জনগোষ্ঠী বৃহত্তর অসমীয়া জাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আসামের চিরসবুজ প্রাকৃতিক পরিবেশের মতো চিংফৌ জনগোষ্ঠী নাচ-গানে, প্রবাদ-প্রবচনে, লোককথা, লোকউৎসবে ও লোকসাহিত্যের অন্যান্য মাল মশলায় সমৃদ্ধ চির নবীন এক জনগোষ্ঠী। বর্তমান সময়ে বিশেষ করে সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বিভাগের বিভিন্ন গবেষক চিংফৌ জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণা শুরু করেছেন। যদিও পূর্বে অনেক গবেষক তাদের উপর গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছেন। কিন্তু স্বল্প পরিসরের মধ্যে বৈচিত্র্যময় জীবনের (জনগোষ্ঠীর) পরিচয় তুলে ধরা সম্ভবপর হয়ে উঠে না। অনেক কিছু অধরা থেকে যায়। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর উপর যত বেশি আলোকপাত বা গবেষণা করা হবে তাদের (জনগোষ্ঠীর) বিচিত্র জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের জ্ঞানের স্পৃহাকে শানিত করবে। চিংফৌ সমাজ সংস্কৃতিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চিংফৌ যুব সমাজ, সরকার, বিভিন্ন ধরণের গণমাধ্যম, বুদ্ধিজীবী, গবেষক সকলের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

**সহায়ক গ্রন্থ:**

১। নিংখী, রাজীবঃ 'চিংফৌ সমাজ আরু সভ্যতা', প্রথম প্রকাশ; নবেম্বর, ২০০৮, লিডু সাহিত্য সভা, লিডু
২। ভট্টাচার্য, শ্রী প্রমোদচন্দ্র (সম্পাদিত): 'অসমর জনজাতি', প্রথম প্রকাশ; ১৯৬২, অসম সাহিত্য সভা, লয়ারছ বুকস্টল, পাণবাজার, গৌহাটি,
৩। দত্ত, দিব্যলতাঃ 'বর্ণাঢ্য জনগোষ্ঠী বর্ণাঢ্য সংস্কৃতি', প্রথম প্রকাশ; সেপ্টেম্বর, ২০১৫, কথা রিডার্স ফরাম, গৌহাটি
৪। শইকিয়া, রুণজুনঃ 'চিংফৌ আরু টাইফাকে সংস্কৃতি' প্রথম প্রকাশ, ২০১৬, উত্তর পূব ভারত লোকসংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র, নগাও-১